২

এই ইউনিটের পাঠটি হচ্ছেঃ

□ পাঠ-১. বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

□ পাঠ-২. বাংলাদেশের শ্রমশক্তির বিন্যাস

□ পাঠ-৩. মোট জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধি

পাঠ-২.১ ঃ বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- স্বাধীনতার আগে এবং পরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কি ছিল:
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার।
- বিষয়ে বিসেষজ্ঞদের সর্বশেষ মতামতটি কি?

প্রাক-স্বাধীনতা কালপর্বে (১৯৬৭-৭০) জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার পরিলক্ষিত হয়-বার্ষিক শতকরা ৩ ভাগ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত হ্রাস পেয়েছে এবং ১৯৮৫ সাল নাগাদ তা ২.১৯ শতাংশে উপনীত হয়েছিল। বর্তমানে তা ১.৩৭ এ নেমেছে।

তথ্যাবলী

২০০১ সালের আদমশুমারিতে জনসংখ্যা ছিল ১৩ কোটি এবং ২০১১ সালে ছিল ১৫ কোটি ১৭ লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ১.৩৭ শতাশ।

তথ্যাবলী

১৯৯১-৯২ সালে হিসাবকৃত জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ১৮ লক্ষ এবং ১৯৯২-৯৩ সালে ১১ কোটি ১৪ লক্ষ। সেই হিসাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.১৭%।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে এবং ১৯৮১ সালে যে দুটি আদমশুমারি হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে সে সময় এ দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ এবং ৮ কোটি ৯ লক্ষ। এই হিসাবে প্রকৃত গণনার ভিত্তিতে সত্তুর দশকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় বার্ষিক শতকরা ২.৩৪ শতাংশ। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বি.বি.এস) হিসাবানুসারে জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১০ কোটি ৪১ লক্ষ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৯৮০'র দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরো হ্রাস পেয়ে হয়েছিল ২.১৯ শতাংশ। আদম-শুমারিতে হিসাবকৃত জনসংখ্যার পরিমাণ ১৯৯১-৯২ সালে ১০ কোটি ৯৮ লক্ষ এবং ১৯৯২-৯৩ সালে ১১ কোটি ১৪ লক্ষ। সেই হিসাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মাত্র শতকরা ২.১৭ ভাগ। ২০০১ সালে আদমশুমারিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারছিল ১.৩৭ ভাগ। ২.১ নং সারণীতে বিভিন্ন সময়ে আদমশুমারিরর হিসাবানুসারে প্রাপ্ত জনসংখ্যা হিসাব প্রদান করা হল।

জন্মহার-মৃত্যুহার এর হিসাব

জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার দৃশ্যমান বা বাস্তব বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি। জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নির্ভর করে প্রতিবছর প্রতি ১০০ জন জনসংখ্যার মধ্যে কতজন জন্ম নিচ্ছেন এবং কতজন মারা যাচ্ছেন তার উপর। সুতরাং এই স্বাভাবিক (জন্ম-মৃত্যু) নীট বৃদ্ধির হারের সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুদ্ধের জন্য বাড়তি মৃত্যু অথবা বহির্গমনের জন্য বাড়তি হ্রাস বাদ দিয়ে আমরা পাই জনসংখ্যার দৃশ্যমান বৃদ্ধির হার। সুতরাং দৃশ্যমান বৃদ্ধির হার জনগণের বহির্গমনের হার এবং অস্বাভাবিক মৃত্যুর হারের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই কারণে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার সচরাচর আমাদের মত দেশে দৃশ্যমান বা বাস্তব জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি হয়ে থাকে।

সারণী ২.১ ঃ আদম-শুমারি অনুসারে প্রাপ্ত বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা এবং তার বার্ষিক চক্রানুক্রমিক বৃদ্ধির হার

আদম-শুমারির বছর	জনসংখ্যা (কোটি)	বৃদ্ধির হার (শতাংশ)	বৃদ্ধির হার (চক্রানুক্রমিক)
১৯০১	২.৮৯	-	
১৯১১	৩.১৫	৯.০৮	০.৯৪
১৯২১	৩.৩২	৫.৩৮	০.৬০
১৯৩১	৩.৫৬	৭.০৭	০.৭৪
১৯৪১	৪.১৯	১৭.৯৬	১.৭০
১৯৫১	৪০৪১ (৪.২০)	৫.১৬	.৫০
১৯৬১	৫.৫২ (৫.০৮)	২৫.০৪	২.২৬
১৯৭৪	৭.৬৩ (৭.১৪)	৩৮.৩৫	২.৪৮
১৯৮১	৮.৯৯ (৮.৭১)	১৭.৬৯	২.৩৫
১৯৯১	১৩.০৫ (১০.৬৩)	২৩.৯৬	২.১৭
২০০১	১২.৯২ (১২.৩১)	১৭.১১	১.৫১
২০১১	১৪.৯৮	১৪.৭৫	১.৩৭

টীকা : ব্র্যাকেটভুক্ত সংখ্যাগুলো হচ্ছে আদমশুমারির গণনাকৃত প্রকৃত সংখ্যা যা গণনাকারীরা বাস্তবে পেয়েছিলেন। কিন্তু হিসাবের ভুল-ত্রুটি বাদ দিয়ে চূড়ান্ত গৃহীত সংখ্যাটি তার চেয়ে সর্বক্ষেত্রেই একটু বেশি ধরা হয়েছে।
উৎস : স্ট্যাটিস্টিক্যাল পকেট বুক, ২০১৮।

২০০০ সালে বাংলাদেশে এক অগ্রবর্তী নমুনা জরিপের (Pilot survey) মাধ্যমে বাংলাদেশের বার্ষিক স্থুল জন্মহার ও মৃত্যু হার সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছিল। ঐ তথ্য থেকে দেখা যায় যে, তখন বাংলাদেশে গড়ে প্রতি বছর প্রতি হাজার মানুষে ৩৩.৪ থেকে ৩৫.০ জন মানুষ জন্মগ্রহণ করতেন। পক্ষান্তরে প্রতি হাজারে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১০.২ থেকে ১২,৩ জন। এই হিসাবানুসারে বাংলাদেশের জনসংখ্যা স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় (৮০-র দশকে) সর্বোচ্চ ২.৪৮ শতাংশ। ([৩৫.০-১০.২]÷১০)। এবং সর্বনিম্ন ২.১১ শতাংশ ([৩৩৪-১২.৩]÷১০)

উপরোক্ত তথ্যাবলী জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে স্বাভাবিক হার দেখাচ্ছে তা বেশ নিচু মানের। এর পক্ষে অন্যতম যুক্তি হচ্ছে যে ৮০'র দশকে জনসংখ্যা হ্রাসের পরিকল্পিত কার্যক্রম এই সময়ে সাফল্যের সঙ্গে কার্যকরী হয়েছে এবং তার ফলে প্রতি হাজারে জন্মের হার প্রাক-স্বাধীনতাকালে যেখানে ছিল ৪৫ তা কমে হয়েছে ৩৫। কিন্তু জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এরকম বিপুল পরিমাণে জন্মহার হ্রাস পাওয়া (প্রায় শতকরা ৩৫ ভাগ) খুবই অস্বাভাবিক এবং বাস্তবে ব্যাপারটা ঠিক তা হয়নি। যদিও আদমশুমারির হিসাবানুসারে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭৪-৮১ কালপর্বে দৃশ্যমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.৩৫ শতাংশ। কিন্তু এই হারকে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার হিসেবে ধরে নিলে ভুল করা হবে। কারণ ১৯৭৪-৮১ কাল পর্বে বাংলাদেশ থেকে নীট বহির্গমনের হার ইতিবাচক ছিল এবং এই সময়ে দুর্ভিক্ষ ও বন্যার কারণে অস্বাভাবিক মৃত্যুর হারও ছিল উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। সুতরাং বাস্তবে প্রাপ্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৩৫ এর চেয়ে স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল উঁচুতে। মোটামুটি হিসাবে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেন যে, ৮০'র দশকে স্বাভাবিক জন্মহার প্রতি হাজারে ষাট দশকের ৪৫-৫০ কমে তা ৪০'র খুব বেশি নিচে নামেনি এবং যে মৃত্যুর হার ষাট দশকে প্রতি হাজারে ছিল ২০ তা থেকে সেটা কমে ৮০ দশকে হয়েছে ১৫। এই হিসেবে স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৮০'র দশকে দাঁড়ায় শতকরা ২.৫ ভাগ। অবশ্য ৮০'র দশকের জন্মহারের সঠিক মাত্রা ৪০ না তার চেয়েও কম হলে কত কম এ নিয়ে বিতর্ক এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। যারা মনে

১৯৭৪-৮১ কালপর্বে দৃশ্যমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.৩৫ শতাংশ। কিন্তু এই হারকে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার হিসেবে ধরে নিলে ভুল করা হবে। কারণ ১৯৭৪-৮১ কাল পর্বে বাংলাদেশ থেকে নীট বহির্গমনের হার ইতিবাচক ছিল এবং এই সময়ে দুর্ভিক্ষ ও বন্যার কারণে অস্বাভাবিক মৃত্যুর হারও ছিল উল্লেখযোগ্য হারে বেশি।

করেন যে, ১৯৭৪-৮১ কালপর্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে নিম্নহার বাস্তবে পরিলক্ষিত হচ্ছে তা আসলে স্বাভাবিক জনসংখ্যা হ্রাসের কারণেই সম্ভব হয়েছে তারা জন্মহার হ্রাসের পক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলো প্রদর্শন করে থাকেন।

১. স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে গড় বিবাহের বয়স ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২. জন্মনিয়ন্ত্রক পদ্ধতির ব্যবহার ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে।
৩. মহিলাদের শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৪. শ্রম ও নানা পেশায় মহিলাদের আগমন ত্বরান্বিত হচ্ছে।
৫. শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পাচ্ছে।

অবশ্য (২০০০ সালে) সকলেই একমত যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিস্ময়কারভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং ২ শতাংশের নিচে নেমে গেছে। যা বর্তমানে ১.৩৭-এ পরিণত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

প্রাক-স্বাধীনতা কালপর্বে (১৯৬৭-৭০) জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমগুলো স্থূল জন্মহারকে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ২.৫ এর বেশ নিচে নেমে এসেছে। ১৯৭৪, ১৯৮১ এবং ১৯৯১ এর আদমশুমারি প্রকৃত গণনার ভিত্তিতে দেখা যায় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাস্তব দৃশ্যমান হার আসলেই ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ২০০১-২০১১ এই সর্বশেষ দুটি গণনা থেকে প্রাপ্ত হিসাবানুসারে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় মাত্র শতকরা ১.৩৭ ভাগ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে শেষ তিন বছর (১৯৬৭-৭০) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল-

ক. ২.৫ শতাংশ; খ. ২.০ শতাংশ; গ. ৩ শতাংশ বা তার উর্ধ্বে

২. জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক হার বাস্তব দৃশ্যমান হারের চেয়ে বেশি হবে যখন-

ক. নীট স্থানান্তর বা বহির্গমন ইতিবাচক হবে;

খ. নীট স্থানান্তর বা বহির্গমন নেতিবাচক হবে;

গ. নীট স্থানান্তর বা বহির্গমন শূণ্য হবে।

৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক হার ১৯৭৪-৮১ কালপর্বে বাংলাদেশে বাস্তবে দৃশ্যমান চেয়ে বেশি ছিল কারণ-

ক. এই সময় ৭৪-এর দুর্ভিক্ষে ও বন্যায় বহু লোকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল;

খ. এই সময় জন্মহার বৃদ্ধি পেয়েছিল;

গ. এই সময় বহু লোক বিদেশ থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন।

৪. বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সম্পর্কে যে দুটি মত চালু আছে তা হচ্ছে-

ক. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হতাশাবাদীদের মতে ২ শতাংশ, আশাবাদীদের মতে ১.৫ শতাংশ;

খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হতাশাবাদীদের মতে ৩ শতাংশ, আশাবাদীদের মতে ২.৫ শতাংশ;

গ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হতাশাবাদীদের মতে ২.৫ শতাংশ, আশাবাদীদের মতে ২.৪ শতাংশ;

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক হার ২.৪ শতাংশের নিচে, এর পক্ষে প্রদত্ত যুক্তিগুলো কি?

২. বাংলাদেশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক হার ২.৫ শতাংশের সমান বা কাছাকাছি, এর পক্ষে প্রদত্ত যুক্তিগুলো কি?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. স্বাধীনতার পরে ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে। এর পেছনের কারণগুলো বর্ণনা করুন।

পাঠ-২.২ ঃ বাংলাদেশের শ্রমশক্তির বিন্যাস

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- স্বাধীন বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে শ্রমশক্তির সরবরাহ কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে;
- উক্ত ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তির কতটুকু শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমের চরিত্র অনুযায়ী তাদের কাজের বিন্যাস কি ছিল।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শ্রমশক্তি বৃদ্ধি

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে শ্রমশক্তির বা পোশাকী ভাষায় যাকে বলা হয় বেসামরিক শ্রমশক্তি (Civilian Labour Force) তার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে শিশু ও বৃদ্ধদের বাদ দিয়ে বাকি সবাইকে সক্ষম বেসামরিক শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। ১০ থেকে ৪৫ এর মধ্যে সকল ব্যক্তিই এই সংজ্ঞানুযায়ী বেসামরিক শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকারী। ২.২ নং সারণী থেকে দেখা যায় স্বাভাবিকভাবেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কিন্তু যেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে ১৯৭৩/৭৪ থেকে ১৯৮৩/৮৪ এই দশ বছরে মোট বেসামরিক শ্রমশক্তির বৃদ্ধি ছিল তুলনামূলকভাবে কম (২ কোটি ১৯ লক্ষ থেকে মাত্র ২ কোটি ৯০ লক্ষ) অবশ্য পাশাপাশি এই সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৭ কোটি ৬৪ লক্ষ থেকে ৯ কোটি ৬৮ লক্ষ। ফলে মোট জনসংখ্যায় বেসামরিক শ্রমমক্তির অনুপাত খুব একটা বৃদ্ধি পায়নি। তা ১৯৭৩/৭৪ সালে ছিল ২৮.৭ শতাংশ এবং ১৯৮৩/৮৪ তে এসে তা সামান্য বেড়ে হয়েছিল ২৯.৯ শতাংশ। কিন্তু ১৯৮৩/৮৪-র পর থেকে জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার তুলনায় বেসামরিক শ্রমশক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশি দ্রুত হারে। ফলে পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৯৫-৯৬ সালে এসে বেসামরিক শ্রমশক্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ। এটা হচ্ছে মোট জনসংখ্যার ৪৬ শতাংশ। মোট জনসংখ্যার মধ্যে কর্মক্ষম লোকের অনুপাতের এই বৃদ্ধি অবশ্যই সাধারণভাবে কাম্য। এর ইতিবাচক তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আগে ১৯৭৪ সালে আমাদের প্রতি ১ জন কর্মক্ষম ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল শিশু-বৃদ্ধের সংখ্যা ছিল প্রায় ২.৫০ জন কিন্তু বর্তমানে ১৯৯৫-৯৬ এ তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১.১৭ জন। এরূপ পরিবর্তনের একটি সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে ৮০'র দশকে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ক্রমাবনতি। যেহেতু এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের হ্রাসের পেছনে মূল কারণ ছিল জন্ম হারের হ্রাস। দ্রুত জন্মহারের হ্রাসের ফলে বয়স-কাঠামো (Age-Structure) পরিবর্তিত হয়েছে "অল্পবয়সী শিশুদের" প্রতিকূলে। পক্ষান্তরে মৃত্যুহার খুব একটা না কমায় বৃদ্ধদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে তেমন বৃদ্ধি পায়নি। ফলে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের কর্মক্ষম বেসামরিক শ্রমশক্তির আপেক্ষিক অনুপাত বিস্ময়কর মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যায় ১০ থেকে ৪৫ বছর বয়সসীমার অন্তর্ভূক্ত লোকের সংখ্যানুপাত বা আপেক্ষিক গুরুত্ব তাই বর্তমানে ৪৬ শতাংশের ওপরেই হবে বলে অনুমান করা যায়।

১৯৮৩/৮৪-র পর থেকে জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার তুলনায় বেসামরিক শ্রমশক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশি দ্রুত হারে। ফলে ১৯৯৫-৯৬ সালে এসে বেসামরিক শ্রমশক্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৪৬%

বেসামরিক শ্রমশক্তির কর্মনিয়োজন মাত্রা

এই পাঠের প্রারম্ভে আমরা দেখিয়েছি যে, মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষম বেসামরিক শ্রমশক্তিও অধিকতর দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আগে যেখানে ১৯৭৩-৭৪ সালে ৩০ শতাংশ লোক কর্মক্ষম এবং কর্মপ্রত্যাশী ছিল ১৯৯৫-৯৬ এ ৪৬ শতাংশ লোক কর্মক্ষম এবং কর্মপ্রত্যাশী। আগে ১৯৭৩-৭৪ সালে যেখানে ২ কোটি ১৯ লক্ষ কাজ করতে সক্ষম এবং কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলেন, ১৯৯৫-৯৬ এ এসে সেরকম লোকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এই বিপুল পরিমাণ কর্মপ্রত্যাশী লোকের মধ্যে কতজন শেষ পর্যন্ত কাজ পেয়েছিলেন? যদি

এক দিকে কর্মক্ষম ও কর্মপ্রত্যাশী লোকের সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু অন্য দিকে এদের জন্য বিপুল পরিমাণে কর্মসুযোগ সৃষ্টি না হয় তাহলে অর্থনীতিতে কর্মক্ষম বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাবে। বেশিরভাগ লোক কাজ চাইছে এটা সুখবর তখনই যখন বেশিরভাগ কর্মোচ্ছুক লোক কাজ পেয়ে যায়।

বাংলাদেশে শ্রমশক্তি জরিপের সংজ্ঞানুসারে একজন কর্মোচ্ছুক দশোর্ধ বয়সের লোককে কর্মে নিয়োজিত ধরা হয় তখনই যখন-

১. সে জরিপকালে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে তার কাজের জন্য আয় উপার্জন করছে।
২. অথবা জরিপকালে সে কোন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক কাজ না করলেও, আসলে সে কিছুদিন পরেই তার সাময়িক ছুটি ফুরালে তা করবে।
৩. অথবা জরিপকালে যাদেরকে দেখা গিয়েছে পারিবারিক খামারে বা প্রতিষ্ঠানে অন্তত: সপ্তাহে ১ ঘন্টার বেশি লাভজনক কাজে নিয়োজিত থাকেন।

এই সংজ্ঞা খুবই উদার সংজ্ঞা। এই উদার সংজ্ঞানুসারেঃ

বাংলাদেশে সাধারণভাবে বেকার লোকের সংখ্যা কর্মক্ষম বেসামরিক শ্রমশক্তির ৪ শতাংশের নিচে। তবে সম্প্রতি এদের পূর্ণমান অল্প হলেও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ১৯৯৫-৯৬ সালের পরিমাণ অনুযায়ী বেকার লোকের সংখ্যা হচ্ছে ১৫ লক্ষ।

এরকম উদার সংজ্ঞানুসারে ১৯৭৩-৭৪ সালে কর্মে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ১৪ লক্ষ। অর্থাৎ মোট বেসামরিক শ্রমশক্তির ৯৭.৭১ শতাংশ। এই হিসাবে ১৯৭৩-৭৪-এ বেকার লোকের সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ। ১৯৩৮ সাল নাগাদ বেকার লোকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৮.২৭ শতাংশ। কিন্তু এরপর থেকে অর্থনীতিতে জরিপলব্ধ তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, বেকারের চরম সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ১৯৯৫-৯৬'এ বেকারের সংখ্যা (অর্থাৎ বেসামরিক শ্রমশক্তির সেই সদস্যরা যারা উদারভাবে সংজ্ঞায়িত কর্মনিয়োজনও পাননি, যদিও তাদের কাজের ইচ্ছা অটুট ছিল)। দাঁড়ায় ১৫ লক্ষ। তখন কর্মনিয়োজনের হার ছিল ৯৭.৩২ শতাংশ, অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ সালের তুলনায় সামান্য কম। যদি আমরা অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ সংজ্ঞাগুলো ব্যবহার করে অর্ধ-বেকারদের বেকারের অন্তর্ভুক্ত করি তাহলে এদের সংখ্যা ও অনুপাত দুইই প্রচুর বৃদ্ধি পাবে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে বাংলাদেশের কর্মক্ষম লোকের এক তৃতীয়াংশ বর্তমানে বেকার বা অর্ধবেকার রয়েছেন।

বাংলাদেশে সাধারণভাবে বেকার লোকের সংখ্যা কর্মক্ষম বেসামরিক শ্রমশক্তির ৪ শতাংশের নিচে। তবে সম্প্রতি এদের পূর্ণমান অল্প হলেও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ১৯৯৫-৯৬ সালের পরিমাণ অনুযায়ী বেকার লোকের সংখ্যা হচ্ছে ১৫ লক্ষ।

বেসামরিক শ্রমশক্তি ঃ নারী-পুরুষ অনুপাত

বাংলাদেশের শ্রমশক্তিতে পুরুষের অনুপাত খুব বেশি, যদিও তা সম্প্রতি নাটকীয়ভাবে কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ১৯৭৩-৭৪ থেকে ১৯৮৩-৮৪ পর্যন্ত বেসামরিক শ্রমশক্তির যে অংশটি কর্মে নিয়োজিত ছিল তাদের বড় অংশটাই ছিল পুরুষ। ১৯৭৩-৭৪ সালে কর্মে নিয়োজিত ২ কোটি ১৪ লক্ষ লোকের মধ্যে ২ কোটি ৫ লক্ষই (অর্থাৎ প্রায় ৯৬ শতাংশ) ছিল পুরুষ। ১৯৮৩-৮৪ সালেও এই অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। তখনও ২ কোটি ৮৫ লক্ষ কর্মে নিয়োজিত শ্রমশক্তির শতকরা ৯১ ভাগ (অর্থাৎ ২ কোটি ৪৯ লাখ) ছিল পুরুষ। এই অবস্থার নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে ১৯৯০/৯১ এবং ১৯৯৫/১৯৯৬-এর শ্রম শক্তি জরিপলব্ধ তথ্যে। ১৯৯০-৯১ সালে ৫ কোটি ২ লক্ষ কর্মে নিয়োজিত শ্রমশক্তির মধ্যে ৩ কোটি ৫ লক্ষ ছিলেন পুরুষ অর্থাৎ শতকরা মাত্র ৬১ ভাগ।

বাংলাদেশের শ্রমশক্তিতে পুরুষের অনুপাত খুব বেশি, যদিও তা সম্প্রতি নাটকীয়ভাবে কমে যাচ্ছে।

১৯৯৫-৯৬ এও তা প্রায় একই রকম রয়ে যায়। তখন ৫ কোটি ৪৫ লাখ কর্মে নিয়োজিত শ্রমশক্তির মাঝে পুরুষের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ কোটি ৩৭ লাখ অর্থাৎ প্রায় ৬২ শতাংশ। [সারণী ২.২ দ্রষ্টব্য]

সারণী ২.২ ঃ শ্রমশক্তি এবং কর্মনিয়োজন (কোটি)

বিষয়	আদমশুমারি (১৯৭৪)	আদমশুমারি (১৯৮১)	শ্রমশক্তিনমুনা জরিপ (১৯৮৩-৮৪)	শ্রমশক্তি জরিপ (১৯৯১-৯১)	শ্রমশক্তি জরিপ (১৯৯৫-৯৬)
জনসংখ্যা	৭.৬৪	৮.৯৯	৯.৬৮	১১.১৪	১২.১৮
বেসামরিক শ্রমশক্তি	২.১৯	২.৫৯	২.৯০	৫.১২	৫.৬০
কর্মে নিয়োজিত বেসামরিক শ্রমশক্তি	২.১৪	২.৫৩	২.৮৫	৫.০২	৫.৪৫
পুরুষ ঃ	২.০৫	২.৩৯	২.৫৯	৩.০৫	৩.৩০
মহিলা ঃ	০.০৯	০.১৪	০.২৬	১.৯৭	২.০৮
বেকার বেসামরিক শ্রমশক্তি	০.০৫	০.০৬	০.০৫	০.১০	০.১৫
পুরুষ ঃ	০.০৫	০.০৬	০.০৫	০.১০	০.০৯
মহিলা ঃ	-	০.০১	০.০১	০.০৪	০.০৬
বেসামরিক শ্রমশক্তির অন্তর্ভূক্ত নয় এমন জনশক্তি কর্মে নিয়োজিত	৫.৪৫	৬.৪০	৬.৭৮	৬.০২	৭.৫৮
কৃষিখাতে ঃ	১.৬৮	১.৫৪	১.৬৭	৩.৪৪	৩.৪৫
অ-কৃষি খাতে ঃ শতাংশ সমূহ	.৪৬	.৯৯	১.১৮	১.৫৮	২.০১
বেসামরিক শ্রমশক্তি (মোট জনসংখ্যার)	২৮.৭	২৮.৮	২৯.৯	৪৬	৪৬
পুরুষ শ্রমশক্তি (মোট পুরুষের)	৫৩.০	৫২.৭	৫৩.৫	৫৪.৩	৫৫.৩
কৃষিখাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি (মোট কর্মনিয়োজিত শ্রমশক্তির)	৭৮.৫	৬০.৯	৫৮.৬	৬৮.৫	৬৩.৩
অকৃষি খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি (ঐ)	২১.৫	২৯.১	৪১.৪	৩১.৫	৩৬.৭
মোট বেসামরিক শ্রমশক্তির (১০ ও তদুর্ধ জনসংখ্যার)	৪৪.২	৪৩.২	৪৩.৯	৬৯.৬	৬৮.৮

টীকা ঃ

১. ১৯৭৪, ১৯৮১ এবং ১৯৮৩-৮৪ পর্যন্ত তথ্য নেয়া হয়েছে, ড. মাহাবুব হোসেন এবং এ.আর খান (১৯৮৯, পৃ: ১৫) থেকে।

২. ১৯৯০/৯১ এবং ১৯৯৫/৯৬ এর তথ্য লেখক কর্তৃক সংকলিত। (বি.বি.এস প্রকাশিত ১৯৯৭ সালের স্ট্যাটিস্টিক্যাল পকেট বুকের ৪.০১ থেকে ৫.১১ নং তালিকায় প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

৩. বেসামরিক শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা হচ্ছেন জরিপকালে কর্মে নিয়োজিত বা বেকার জনগোষ্ঠি যারা প্রত্যেকেই ১০ বছরের বেশি বয়সের অধিকারী। এই হিসেবে যে সব ব্যক্তি ঘরেই নানারকম কাজ করছেন যেমন ধান মাড়াই, ধান ভানা, পশুপালন, মুরগি চাষ, রান্না ইত্যাদি তাদেরকেও শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর কর্মে নিয়োজিত শ্রমশক্তি বলতে বোঝানো হয়েছে তাদেরকে যাদের বয়স ১০ এর উপর এবং যারা জরিপকালে-

(ক) কোন আয়ের বিনিময়ে কাজ করেছেন বলে দেখা গেছে।

(খ) সাময়িকভাবে লাভজনক কাজ থেকে ছুটি নিয়ে ঘরে বসে আছেন।

(গ) যারা পারিবারিক খামারে বা প্রতিষ্ঠানে কোন আয় ছাড়াই কাজ করছেন (অন্তত: ১ ঘন্টার বেশি)।

এই একই প্রবণতা অন্যভাবেও পরিমাপ করা সম্ভব। ২.২ নং সারণীর আরেকটি তথ্য থেকে দেখা যায় যে ১৯৭৩ -৭৪ সালে বাংলাদেশের মোট পুরুষ জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ বেসামরিক শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে মোট মহিলার মাত্র ২.৫ শতাংশ ছিলেন তখন বেসামরিক শ্রমশক্তির

অন্তর্ভুক্ত। ১৯৮৩-৮৪ সালেও তা খুব একটা বাড়েনি। তখনও তা ছিল মোট মহিলা জনসংখ্যার মাত্র ৩.৪ শতাংশ। কিন্তু ১৯৯০/৯১ এ তা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। তখন মোট মহিলা জনসংখ্যার ৩৭.১ শতাংশ বেসামরিক শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৯৫-৯৬ এ তা সামান্য হ্রাস পেলেও ১৯৭৩-৭৪ এর তুলনায় তা অনেক বেশিই ছিল (প্রায় ৩৬ শতাংশ)।

কর্মে নিয়োজিত শ্রমশক্তির খাতওয়ারী বিন্যাস

বাংলাদেশে কর্মনিয়োজন বিন্যাস এমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি যাতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর "গতিশীল বহুমুখীকরণ" হচ্ছে।

আমরা আগে আলোচনায় দেখিয়েছি যে, কর্মনিয়োজনের প্রচলিত উদার সংজ্ঞানুসারে আমাদের দেশে কর্মক্ষম শ্রমশক্তির প্রায় ৯৭ শতাংশ কর্মে নিয়োজিত। এদের মধ্যে করার কোন খাতে নিয়োজিত তার উপরে নির্ভর করছে বাংলাদেশের খাতওয়ারী কর্মনিয়োজন বিন্যাস। ২.২ নং সারণীতে আমরা সমগ্র অর্থনীতিকে মাত্র দু'টি খাতে বিভক্ত করছি-কৃষি ও অকৃষি খাত এবং দুই খাতে কর্মে নিয়োজিত শ্রমশক্তি কিভাবে বন্টিত হচ্ছে তার কালানুক্রমিক চিত্র তুলে ধরেছি। লক্ষ্যনীয় যে ১৯৭৩-৭৪ সাল থেকে ১৯৮৩-৮৪ সাল পর্যন্ত কৃষি খাতে কর্মনিয়োজনের মোট সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। আপেক্ষিকভাবে কৃষি খাতে নিয়োজিত লোকসংখ্যা এই সময়কালে ৭৮.৫ শতাংশ থেকে কমে ৫৮.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। এ থেকে মনে হতে পারে যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব কমছে এবং অকৃষির গুরুত্ব বাড়ছে, অন্তত: শ্রমশক্তি নিয়োজনের নিরিখে। এই বিষয়টি কি বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রগতির পরিচায়ক নয়?

১৯৭৩-৭৪ সাল থেকে ১৯৮৩-৮৪ সাল পর্যন্ত কৃষি খাতে কর্মনিয়োজনের মোট সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। আপেক্ষিকভাবে কৃষি খাতে নিয়োজিত লোকসংখ্যা এই সময়কালে ৭৮.৫ শতাংশ থেকে কমে ৫৮.৬ শতাংশে নেমে এসেছে।

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদানের আগে আমাদের চিন্তা করে দেখা উচিত কোন্ কোন্ অবস্থায় সচরাচর একটি অর্থনীতিতে অকৃষি খাতের অনুকুলে কর্মনিয়োজন বৃদ্ধি পেতে পারে। ড. মাহাবুব হোসেন ও ড. এ.আর. খান তাদের গ্রন্থে ১৯৭৩/৭৪-১৯৮৩/৮৪ কালপর্বে কৃষিখাতে নিয়োজিত লোকসংখ্যার চরম মানের (Absolute level) হ্রাসের সম্ভাব্য তিনটি ব্যাখ্যা হাজির করেছেন।

ব্যাখ্যা-১ঃ এমন হতে পারে যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি "গতিশীল বহুমুখীকরণ" হচ্ছে। অর্থাৎ অন্য সমস্ত দেশের মতই বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক বা একখাত ভিত্তিক অর্থনীতির বদলে বহুমুখী অর্থনীতির দিকে মোড় নিচ্ছে। অকৃষি খাত দ্রুত বিকশিত হতে থাকলে এক্ষেত্রে কৃষিখাত থেকে শ্রমশক্তি উচ্চতর মজুরির আকর্ষণে অকৃষিখাতে ধাবিত হবে। অন্যদিকে কৃষিখাতে কম শ্রমশিক্ত দিয়েই আগের উৎপাদন অক্ষুন্ন রাখার তাগিদে সেখানেও শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ এ অবস্থায় এক সঙ্গে অকৃষি খাতের এবং কৃষি খাতের শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। ফলে কৃষি ও শিল্পখাতে শ্রমের প্রকৃত মজুরিও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা এবং সামগ্রিক বিচারে অর্থনীতির সৃস্পষ্ট লক্ষণীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হওয়ার কথা।

ব্যাখ্যা-২ ঃ বাংলাদেশের কৃষির শ্রমধারণক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় ক্রমবর্ধমান শ্রমের সবটাই এবং এমনকি পুরাতন শ্রমবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশও কৃষি থেকে বের হয়ে অন্যত্র কাজ খুঁজতে বাধ্য হতে পারে। সেক্ষেত্রে কৃষি খাত থেকে বের হয়ে অকৃষি খাতে তারা যে কাজ পাবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নেই সম্ভবত এ অবস্থায় মানুষ অকৃষি খাতের মধ্যে যেসব অনানুষ্ঠানিক (Informal) উপখাতসমূহ আছে যেমন- আত্মনিয়োজিত ক্ষুদ্র ব্যবসা, ফেরিওয়ালাগিরি, টুকি-টাকি কাজ, সেবা ইত্যাদিতে নিয়োজিত হবে। ফলে পরিসংখ্যান অনুযায়ী কৃষি খাতের তুলনায় অকৃষি খাতের

আপেক্ষিক কর্মনিয়োজন বেড়ে গেলেও, এতে আত্মসন্তুষ্ট হওয়ার কোন অবকাশ নেই। এই অবস্থায় কৃষি বা অকৃষি খাত কোন খাতেই শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে না। এসব খাতে মজুরিরও বৃদ্ধি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

ব্যাখ্যা-৩ঃ এমন হতে পার যে কৃষি খাতে কিছুটা যান্ত্রিকীকরণ হওয়ায় কৃষিখাতে কর্মে নিয়োজিত কিছু লোক কর্মচ্যুত হয়েছে এবং তারা অবশেষে অকৃষি খাতের টুকিটাকি কাজে নিয়োজিত হয়েছে। এই অবস্থায় কৃষিখাতে শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে ঠিকই কিন্তু কৃসি খাতে শ্রমশক্তির চাহিদা বৃদ্ধির জন্য তা হবে না বরং চাহিদা সংকুচিত হবে এবং প্রকৃত মজুরি কৃষিখাতে হ্রাসও পেতে পারে। পাশাপাশি অকৃষি খাতে নিম্ন উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অকৃষি খাতেও শ্রমের উৎপাদনশীলতা কমতে পারে।

ড.এ.আর.খান ও ড. মাহবুব হোসেনের তথ্য থেকে দেখা যায় ১৯৭৩/৭৪-১৯৮৩/৮৪ কালপর্বে শ্রমিক পিছু মূল্যসংযোজন (Value added per worker) কৃষি খাতে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পখাতে প্রায় অপরিবর্তিত বা সামান্য হ্রাস পেয়েছে এবং ব্যবসা-পরিবহন ও নির্মাণ খাতে বিপুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। এই সময় কৃষি খাতে প্রকৃত মজুরিও বৃদ্ধি পায়নি। অতএব, সামগ্রিক ভাবে দেখা যায় যে, তৃতীয় ব্যাখ্যাটিই বাংলাদেশে অধিকতর প্রযোজ্য।

সারণী ২.৩ ঃ কর্মে নিয়োজিত শ্রমশক্তির খাতওয়ারী বিন্যাস

	১৯৭৩-৭৪	১৯৮৩-৮৪	১৯৯৫-৯৬
কর্মে নিয়োজিত শ্রমশক্তি (কোটি)	২.১৪	২.৮৫	৫.৪৫
কৃষিখাত (শতাংশ)	১.৬৮(৭৮)	১.৬৭(৫৯)	৩.৪৫(৬৩)
ব্যবসা-বাণিজ্য (শতাংশ)	০.৮(৪)	.৩৩(১১)	.৬১(১১)
যাতায়াত ও যোগাযোগ (শতাংশ)	.০৪ (২)	.১১(৪)	.২৩(৪)
নির্মাণ (শতাংশ)	-	.০৫(২)	.১০(২)
সেবা (শতাংশ)	.২২(১০)	.২৩(৮)	.৫৩(১০)
অন্যান্য (শতাংশ)	.০২(১)	.২১(৭)	.১১(২)

টীকা: ১. এখানে কৃষি খাত বলতে কৃষি, মৎস্য, পশু-পাখি ও বন এই চারটি উপখাতের সমষ্টি বোঝানো হয়েছে; শিল্পখাত বলতে শিল্প, বিদ্যুৎ পানি এবং গ্যাস এই চারটি উপখাতের সমষ্টি বোঝানো হয়েছে। সেবা খাত বলতে সকল ধরনের ব্যাংকিং সেবা, সরকারী-বেসরকারী ও এনজিও খাতের বিভিন্ন সেবামূলক চাকুরীর সমষ্টি বোঝানো হয়েছে। অন্যান্য খাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিভিন্ন পারিবারিক ক্রিয়া-কান্ড ও বাদবাকি অর্থনৈতিক কার্যক্রম।

২. সারণীর ১৯৭৩-৭৪ ও ১৯৮৩-৮৪ এর হিসাবগুলো, ড. মাহাবুব হোসেন ও এ.আর.খান (১৯৯১, পৃ: ১৬) থেকে সংকলিত। ১৯৯৫-৯৬ এর হিসাবগুলো লেখক কর্তৃক সংকলিত। উৎস হচ্ছে হচ্ছে বি.বি.এস কর্তৃক প্রকাশিত স্ট্যাটিস্টিক্যাল পকেট বুক, ১৯৯৭ (সারণী নং ৪.০৮)।

১৯৮৩-৮৪ পরবর্তীকালের কর্মনিয়োজন বিন্যাসে আবার উল্টোমুখী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ২.৩ নং সারণী থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, কৃষিতে ১৯৮৩-৮৪ থেকে ১৯৯৫-৯৬ কালপর্বে শিল্পখাতে কর্মনিয়োজিনের গুরুত্ব ৯ শতাংশ থেকে আরও হ্রাস পেয়ে ৮ শতাংশে নেমে এসেছে। অন্যদিকে কৃসি খাতে কর্মনিয়োজনের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫৯ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬৩ শতাংশ। কৃষি ও

কৃষি ও শিল্প বহির্ভুত অন্যান্য অকৃষিজ উপখাতের মধ্যে একমাত্র সেবা খাতে কর্মনিয়োজনের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০ শতাংশে উপনীত হয়েছে

শিল্প বহির্ভুত অন্যান্য অকৃষিজ উপখাতের মধ্যে একমাত্র সেবা খাতে কর্মনিয়োজনের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০ শতাংশে উপনীত হয়েছে। এ থেকে অন্তত: এটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ১৯৮৪ পরবর্তী বাংলাদেশে কোন "গতিশীল বহুমুখীকরণ" (Dynamic Diversification) সংগঠিত হয়নি। তবে ৯০ দশকে কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের লক্ষণ সুস্পষ্ট। তাই যান্ত্রিকীকরণ সত্ত্বেও কৃষিতে শ্রম নিয়োগের বৃদ্ধি প্রমাণ করে যে এই যান্ত্রিকীকরণ সম্ভবত: চাষের তীব্রতাও বৃদ্ধি করেছে।

সারসংক্ষেপ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বাংলাদেশে বেসামরিক শ্রমশক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ৮০-র দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ: কমে যাওয়ার কারণে জনসংখ্যার বয়স কাঠামো "১০ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের" প্রতিকূলে পরিবর্তিত হওয়ায় জনসংখ্যার মধ্যে সক্ষম শ্রমশক্তির অনুপাত নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। এই সক্ষম জনশক্তির বড় অংশই উদার অর্থে কোন না কোন কাজে নিয়োজিত হতে সক্ষম হয়েছেন। উদারভাবে দেখলে এই কর্মনিয়োজনের হার দাঁড়াবে প্রায় ৯৭ শতাংশ। সংকীর্ণ অর্থে অবশ্য প্রায় এক তৃতীয়াংশ কর্মক্ষম লোককে বেকার-অর্ধবেকার হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব। কর্মনিয়োজনের বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে কৃষি খাতেই এখনো অধিকাংশ লোক কর্মরত। ১৯৭৩/৭৪-১৯৮৩/৮৪ কালপর্বে কৃষিখাতে কর্মে নিয়োজিত লোকসংখ্যার চরম মান (Absolute level) হ্রাস পায়; কিন্তু এ থেকে অর্থনৈতিক কাঠামোতে "গতিশীল বহুমুখীকরণ" ঘটেছে এরূপ ধারণা পোষণ করলে তা হবে খুবই ভুল। কারণ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী এর বিপরীতটাই সাক্ষ্য দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বেসামরিক শ্রমশক্তির সংখ্যা

ক. বৃদ্ধি পায়; খ. হ্রাস পায়; গ. বৃদ্ধিও পেতে পারে, হ্রাস ও পেতে পারে।

২. বেসামরিক শ্রমমক্তির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন

ক. ১০ বছরের উর্ধ্বে সকল ব্যক্তি;

খ. ১০ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে সকল ব্যক্তি;

গ. ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে সকল যুবক।

৩. বাংলাদেশে বেসামরিক শ্রমশক্তির মাঝে কর্মে নিয়োজিত শ্রমশক্তির অনুপাত হচ্ছে-

ক. ৯০ শতাংশ; খ. ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ; গ. ৯৫ থেকে ৯৯ শতাংশ।

৪. ৮০-র দশকে কর্মনিয়োজন বিন্যাসে যে পরিবর্তন হয়েছিল তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল-

ক. কৃষিখাতে কর্মনিয়োজনের অনুপাত হ্রাস পেয়েছে;

খ. কৃষিখাতে কর্মনিয়োজনের অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে;

গ. কৃষিখাতে কর্মনিয়োজন অনুপাত অপরিবর্তিত রয়েছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. বেসামরিক শ্রমশক্তি, কর্মে নিয়োজিত বেসামরিক শ্রমশক্তি এবং কৃষিখাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি-এই প্রত্যয়গুলোর সংজ্ঞা দিন ও পার্থক্য নির্দেশ করুন।

২. আপনার পাড়ার যেকোন ৫টি পরিবারের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানগুলো নির্ধারণ করুন-

১. মোট জনসংখ্যা। ২. মোট বেসামরিক শ্রমশক্তি।

৩. মোট পুরুষ বেসামরিক শ্রমশক্তি। ৪. মোট মহিলা বেসামরিক শ্রমশক্তি।

৫. মোট কর্মনিয়োজিত বেসামরিক শ্রমশক্তি। ৬. মোট বেকারের সংখ্যা।

৭. কর্মনিয়োজনের খাতওয়ারী বিন্যাস।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. কৃষিখাতে কর্ম নিয়োজনের আপেক্ষিক হারের গতি প্রবণতা বর্ণনা করুন। এটাকে কি "গতিশীল বহুমুখীকরণ" বলে অভিহিত করা যায়?

পাঠ ২.৩ ঃ মোট জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধি

এই পাঠ থেকে আপনি জানতে পারবেন-

- মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন ও মাথাপিছু মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন বাংলাদেশে স্বাধীনতার আগে ও পরে কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তার একটি তুলনামূলক বিবরণ।

- বিভিন্ন রাজনৈতিক শাসনামলে মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি হারের গড় প্রবণতা (Average Trend Rate) কি ছিল তার একটি হিসাব।
- বাংলাদেশের জন্য ন্যূনতম ইপ্সিত প্রবৃদ্ধির হার কত হওয়া উচিত।

প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর কাল ঃ মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন ও মাথাপিছু উৎপাদনের তথ্যের উৎসাঃ

বাংলাদেশের জন্য বছরওয়ারী মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন এবং জনসংখ্যার কালানুক্রমিক হিসাবের একটি তথ্য তালিকা পাওয়া যায় মহিউদ্দিন আলমগীর ও বারলেজ কর্তৃক লিখিত, বি.আই.ডি.এস কর্তৃক প্রকাশিত একটি পুস্তকে ঃ "বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্‌কাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার ঃ ১৯৪৯/৫০-১৯৭৯/৭০" (ঢাকা, জুন, ১৯৭৪)। কিন্তু এখানে প্রদত্ত জি.ডি.পি-র পরিমাপটি করা হয়েছে ১৯৫৯-৬০ সালে বিরাজমান বাজার দামের ভিত্তিতে।

পরবর্তী ১৯৬৯-৭০ সাল থেকে ১৯৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত জি.ডি.পি'র পরিমাপ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক "বাংলাদেশ ইকনমিক সার্ভে" নামক গ্রন্থে। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয়ের এই পরিমাপ করা হয়েছে ১৯৭৩-৭৪ এর বাজার দামে। পরবর্তীতে এই দুই হিসাব একত্রিত করে প্রয়োজননানুযায়ী বাজার দামের সামঞ্জস্যতা বিধান করে ১৯৪৯-৫০ সাল থেকে ১৯৮৬-৮৭ সাল পর্যন্ত একটি একক তথ্য তালিকা তৈরি করেছেন অর্থনীতিবিদ মাহাবুব হোসেন ও এ.আর.খান। তাদের গ্রন্থে উদ্ধৃত তালিকাটি ১৯৭৩-৭৪ এর বাজার দামের ভিত্তিতে প্রণীত। ৩.১ নং সারণীতে তা তুলে ধরা হল।

তুলনামূলক মূল্যায়ন

এই বিস্তৃত তালিকা থেকে তুলনামূলক মূল্যায়ন দুঃসাধ্য। তালিকায় আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এখানে জি.ডি.পি (মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন) এবং জি.এন.পি'র (মোট জাতীয় উৎপাদন) মধ্যে একটি পার্থক্য বিধান করা হয়েছে। এই পার্থক্য বোঝার জন্য নিম্নোক্ত সমীকরণটি আগে বুঝতে হবে-

জি.এন.পি = জি.ডি.পি - নীট অপ্রত্যক্ষ করা

(বাজার দামের সামঞ্জস্যতা বিধানের পরে) + নীট বৈদেশিক উৎপাদনের-উপাদান আয় (Net Factor Income from the rest of the World) উপরোক্ত সমীকরণ থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, G.D.P এবং G.N.P এক জিনিস নয়। সাধারনত: পণ্যের উপর অপ্রত্যক্ষ কর থেকে পন্য বাবদ প্রদত্ত ভর্তুকি বাদ দিয়ে নীট অপ্রত্যক্ষ কর হিসাব করা হয়। এটি ইতিবাচক হলে, বাজার দামে হিসাবকৃত জি.ডি.পি, জি.এন.পি-র চেয়ে বেশি হবে। আবার যদি বিদেশ থেকে পাঠানো বাংলাদেশে উৎপাদন-উপাদানের আয়, বাংলাদেশের নিয়োজিত বিদেশী উৎপাদন-উপাদানের আয়ের চেয়ে বেশি হয়। তাহলে নীট বৈদেশিক উৎপাদন-উপাদান আয় ইতিবাচক হয়। সেক্ষেত্রেও জি.এন.পি, জি.ডি.পি-র তুলনায় পরিমাণগতভাবে বেশি হবে।

সারণী ৩.১ ঃ জি.ডি.পি, জি.এন.পি, মাথাপিছু জি.ডি.পি ও মাথাপিছু জি.এন.পি-র গতি প্রবণতাঃ ১৯৪৯-৫০-১৯৮৬-৮৭ (১৯৭২-৭৩ স্থির বাজার দাম মিঃ টাকায়)

বছর	জি.ডি.পি	জি.এন.পি	মাথাপিছু জি.ডি.পি	মাথাপিছু জি.এন.পি
১৯৪৯-৫০	২৭২৩৩	২৭১৮৯	৬৪৫	৬৪৪
১৯৫০-৫১	২৮৬৯৬	৫৮৬৫৫	৬৬৪	৬৬৩

১৯৫১-৫২	২৯৬৬০	২৯৬৩৫	৬৭০	৬৬৯
১৯৫২-৫৩	৩১৯৪৫	৩০৫২৮	৬৭৩	৬৭২
১৫৫৩-৫৪	৩১৯৪৫	৩১৮৮২	৬৮৭	৬৮৬
১৯৫৪-৫৫	৩১২৩২	৩১২২৪	৬৫৬	৬৫৬
১৯৫৫-৫৬	২৯৯২৩	২৯৮৮৪	৬১৩	৩১২
১৯৫৬-৫৭	৩৩১১৯	৩৩০৮৩	৬৬২	৬৬২
১৯৫৭-৫৮	৩২৪৫৪	৩২৪৪৪	৬৩৪	৬৩৪
১৯৫৮-৫৯	৩০৬৪১	৩০৬১৭	৫৮৪	৫৮৩
১৯৫৯-৬০	৩৪১৩৪	৩৪০৯৩	৬৩৪	৬৩৪
১৯৬০-৬১	৩৫৮৩৩	৩৫৮১১	৬৫০	৬৫০
১৯৬১-৬২	৩৮৩৫৫	৩৮৫০১	৬৮১	৬৮০
১৯৬২-৬৩	৩৯২২২	৩৯১৪২	৬৭৫	৬৭৪
১৯৬৩-৬৪	৪২৮৮১	৪২৭৬০	৭১৮	৭১৬
১৯৬৪-৬৫	৪৩৫৬৩	৪৩৫৭৫	৭১১	৭১১
১৯৬৫-৬৬	৪৫০৪১	৪৫০৫৩	৭১৬	৭১৬
১৯৬৬-৬৭	৪৫৪৮২	৪৫৪৯৪	৭০৪	৭০৪
১৯৬৭-৬৮	৪৯৫০০	৪৯৫১২	৭৪৪	৭৪৫
১৯৬৮-৬৯	৫০৯৫৩	৫০৯৬৫	৭৪৪	৭৪৪
১৯৬৯-৭০	৫১৮৩৩	৫১৮৪০	৭৩৪	৭৩৪
১৯৭২-৭২	৪৫৩০০	৪৫৩০০	৬১১	৬১১
১৯৭৩-৭৪	৪৯০৭২	৪৯২২৫	৬৪২	৬৪৪
১৯৭৪-৭৫	৫১৫৩৫	৫১৬৫৭	৬৬১	৬৬২
১৯৭৫-৭৬	৫৫৩৭২	৫৫৫৩৯	৬৯৩	৬৯৫
১৯৭৬-৭৭	৪৫৩৬৯	৫৬৬০৯	৬৮৯	৬৯২
১৯৭৭-৭৮	৬০২৪০	৬০৭৭২	৭২০	৭২৬
১৯৭৮-৭৯	৬২৮১৩	৫৩৫১৯	৭৩৪	৭৪২
১৯৭৯-৮০	৬৩৫৮৬	৬৪৭৬৩	৭২৬	৭৩৯
১৯৮০-৮১	৫৭৫১৪	৬৯২৯৯	৭৫৪	৭৭৩
১৯৮১-৮২	৬৮৪৬০	৭০০৩৪	৭৪৩	৭৬০
১৯৮২-৮৩	৭০৮১৭	৭৩৮৩৯	৭৫০	৭৮২
১৯৮৩-৮৪	৭৩৮০৪	৭৬৫১১	৭৬২	৭৯০
১৯৮৪-৮৫	৭৬৬৭৯	৭৮৩৪৯	৭৭৩	৭৯০
১৯৮৫-৮৬	৭৯৭৯২	৮২৩২১	৭৮৫	৮০৯
১৯৮৬-৮৭	৮৩২৯২	৮৬৫২৩	৮০০	৮৩১

উৎস ঃ ড. মাহাবুব হোসেন ও এ.আর.খান (প্রাক্ত) পৃ: ২০

৩.২ নং সারণীতে স্বাধীনতার ঠিক আগের ১০ বছরের গড় প্রবৃদ্ধির হারের সঙ্গে স্বাধীনতা পরবর্তী ১০ বছরের অর্থাৎ ১৯৭২-৭৩-১৯৮৬-৮৭ সাল পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হারের একটি তুলনামূলক বিবরণ উপস্থিত করা হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ততর তালিকা থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, স্বাধীনতার আগে আমাদের জি.ডি.পি বা জি.এন.পি উভয়ই প্রায় সমান হারে অর্থাৎ ৩.২০ ও ৩.২১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যেহেতু ঐ সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধি গড় হার ছিল ২.৫ শতাংশের উপরে সেহেতু

স্বাধীনতার আগের তুলনায় স্বাধীনতার পরে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ছিল

প্রাক-স্বাধীনতা শেষ দশ বছর আমাদের মাথাপিছু জাতীয় আয়/অভ্যন্তরীন উৎপাদন উভয়ই গড়ে মাত্র .৬৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পক্ষান্তরে স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭ কালপর্বে ডি.ডি.পি'র গড় প্রবৃদ্ধির হার ৩.২০ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৪.২৯ শতাংশ। জি.ডি.পি'র গড় প্রবৃদ্ধির হারও আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪.৫ শতাংশ। যেহেতু এই সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪.৫৮ শতাংশ। যেহেতু এই সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কোনক্রমেই ২.৫ শতাংশের উপরে ছিল না সেহেতু এই সময় গড় মাথাপিছু জি.ডি.পি ও জি.এন.পি'র প্রবৃদ্ধির হার কমপক্ষে হয়েছিল ১.৯০ শতাংশ এবং ২.১৮ শতাংশ যা প্রাক-স্বাধীনতা আমলের হার দুইটির তুলনায় প্রায় ১৮৭ শতাংশ এবং ২৩০ শতাংশ বেশি। এ থেকে কি আমরা এই মূল্যায়ন করতে পারি যে, স্বাধীনতার আগের তুলনায় স্বাধীনতার পরে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার (Ecnomic Growth Rate) অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তা কি স্বাধীনতা উত্তর উন্নত অর্থনৈতিক পারদর্শিতা পরিচয় দিচ্ছে?

সারণী ৩.২ ঃ গত প্রবৃদ্ধির হারের গতি প্রবণতা (শতাংশ/বছর) ঃ স্বাধীনতার আগে ও পরে

প্রাক-স্বাধীনতা কালপর্বে (১৯৪৯/৫০-১৯৬৯/৭০)	জি.ডি.পি/জি.এন.পি	মাথাপিছু জি.ডি.পি/জি.এন.পি
জি.ডি.পি	৩২০	০.৬৬
জি.এন.পি	৩.২১	০.৬৬
স্বাধীনতাউত্তর কালপর্বে (১৯৭২/৭৩-১৯৮৬/৮৭)	জি.ডি.পি/জি.এন.পি	মাথাপিছু জি.ডি.পি/জি.এন.পি
জি.ডি.পি	৪.২৯	১.৯০
জি.এন.পি	৪.৫৮	২.১৮

উৎস ঃ ড. মাহাবুব হোসেন ও এ.আর.খান প্রাগুক্ত, পৃ: ২২

স্বাধীনতা পরবর্তী উচ্চতর প্রবৃদ্ধির কতিপয় সীমাবদ্ধতা

এ কথা ঠিক পরিমাণগত বিচারে স্বাধীনতা পরবর্তীতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার মোট জি.এন.পি/জি.ডি.পি বা মাথাপিছু জি.এন.পি/জি.ডি.পি উভয় নিরিখেই উচ্চতর ছিল। কিন্তু গুণগত বিচারে এই উচ্চতর প্রবৃদ্ধির হারের কতকগুলো সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা ও বৈশিষ্ট্যের কথাও আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন।

প্রথমত: স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সমগ্র দেশের উপর দিয়ে যে তান্ডবলীলা বয়ে যায় সমগ্র অর্থনীতির যে ধ্বংস সাধন হয় তার পরিণতি হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতা পরবর্তীতে জাতীয় আয় বা মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন উভয়ই যথেষ্ট নিচে নেমে যায়। ১৯৭২-৭৩ সালেও এই সূচনাবিন্দুর আয় (Base Income) মাত্রা যথেষ্ট নিচুতেই বিদ্যমান ছিল। ফলে স্বভাবত:ই স্বাধীনতা পরবর্তী প্রবৃদ্ধির হার একটু উঁচুই হবে এবং তার অর্থ এই নয় যে, আমরা অর্থনৈতিক পারদর্শিতার পরিচয় দিচ্ছি বরং তার অর্থ আমরা নিচু সূচনা বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করায় অল্প বৃদ্ধিই পরিগণিত হয়েছে খুব উঁচু হারের প্রবৃদ্ধি হিসেবে।

বস্তুত ১৯৬৮-৬৯ সালে প্রাক-স্বাধীনতা আমলের সর্বোচ্চ গড় মাথাপিছু আয় ছিল ৭৪৪ টাকা (১৯৭৩-৭৪ বাজার দামে)। আর স্বাধীনতার পর অপেক্ষাকৃত দ্রুত হারের প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সত্ত্বেও সর্বমোট নয় বছর লেগেছে আমাদেরকে সেই প্রাক-স্বাধীনতা মাথাপিছু আয়ের মাত্রায় পৌঁছাতে। বস্তুত: ১৯৮১-৮২ সালে এসে আমাদের মাথাপিছু আয় ১৯৬৯-৭০ সালের মাথাপিছু আয়ের সমান হয়েছে। অবশ্য ৩.১ নং তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৮৬-৮৭ সাল নাগাদ আমাদের মাথাপিছু জি.এন.পি হয়েছিল ৮৫৫ টাকা এবং এটা ছিল স্বাধীনতার আগে অর্জিত সর্বোচ্চ মাথাপিছু আয়ের তুলনায় ৭.৫ শতাংশ বেশি। আর গড়ে হিসাবানুসারে ১৯৮১-৮৬ কালপর্বে আমাদের স্বাধীন

স্বাধীনতার বাংলাদেশের জি.ডি.পি'র বিন্যাস ছিল তুলনামূলকভাবে জনপ্রশাসন, প্রতিরক্ষা এবং বিবিধ সেবা খাতের অধিকতর অনুকূলে।

বাংলাদেশের গড় মাথাপিছু আয় পাকিস্তানের শেষ পাঁচ বছর অর্থাৎ ১৯৬৫-৭০ কালপর্বের গড় মাথাপিছু আয়ের তুলনায় ৫ শতাংশ বেশি হয়েছিল।

অবশ্য এই কথাও আমাদের মনে রাখা উচিত যে, স্বাধীন বাংলাদেশে জি.ডি.পি'র বিন্যাস ছিল তুলনামূলকভাবে জনপ্রশাসন (Public Administration) প্রতিরক্ষা (Defense) এবং বিবিধ সেবা খাতের অধিকতর অনুকুলে। এক হিসেবে দেখা যায় যে, ষাট দশকের শেষের দিকে উপরোক্ত খাতগুলো যে জায়গায় জি.ডি.পি'তে অবদান বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১২.৫ শতাংশ। এটি গুণগত বিচারে উন্নতির লক্ষণ নয়।

এছাড়া স্বাধীনতা উত্তর উচ্চতর প্রবৃদ্ধির আরেকটি দিক হচ্ছে এই সময় জি.ডি.পি'র প্রবৃদ্ধির হারের তুলনায় জি.এন.পি'র প্রবৃদ্ধির হার অনেক বেশি বেড়ে যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে, এই উচ্চতর প্রবৃদ্ধির হারের পেছনে কাজ করেছে স্বাধীনতা উত্তরকালে বাইরে থেকে পাঠানো নিট উৎপাদন উপাদান আয় (Net Factor Income) এর দ্রুত বৃদ্ধি। অর্থাৎ এই উচ্চতর প্রবৃদ্ধির পেছনে অভ্যন্তরীন অর্থনৈতিক কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রেরণা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। এই সময় বহু লোক বিদেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন এবং তাদের পাঠানো রেমিটেন্স প্রতিবছর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ফলে এই সময় অর্থাৎ ১৯৮০-র পর থেকে জি.এন.পি সর্বদাই জি.ডি.পি-র চেয়ে বড় ছিল [পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য]

বিভিন্ন রাজনৈতিক শাসনামলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গড় প্রবণতা

আগের পরিচ্ছেদে আমরা সাধারণভাবে পাকিস্তানী শাসনামলে (১৯৪৯/৫০-১৯৬৯/৭০) এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী (১৯৭২/৭৩-১৯৮৬-৮৭) আমলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গড় প্রবণতার চিত্রটি তুলে ধরেছি। এই পরিচ্ছেদে আমরা স্বাধীনতা পরবর্তীকালের বিভিন্ন রাজনৈতিক শাসনামলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গড় হার কি ছিল তার বিবরণ তুলে ধরবো।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গত ২৭ বছরে খুব ক্ষণস্থায়ী সরকারগুলোর কথা বাদ দিলে, আমরা মোট পাঁচটি উল্লেখযোগ্য সরকারের শাসনামুলের সাক্ষ্য পাই। সেগুলো যথাক্রমে নিম্নরূপ-

ক. ১৯৭২-৭৩ খেকে ১৯৭৫-৭৬ ঃ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওত্বাধীন আওয়ামীলীগ সরকার।
খ. ১৯৭৬-৭৭ থেকে ১৯৮১-৮২ ঃ জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন বি.এন.পি সরকার।
গ. ১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৯-৯০ ঃ হোসেইন মু. এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির সরকার।
ঘ. ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৪-৯৫ ঃ বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বি.এন.পি সরকার।
ঙ. ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০১ ঃ শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার।
চ. ২০০১ থেকে ২০০৬ ঃ বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বি.এন.পি সরকার।
ছ. ২০০৬ থেকে ২০০৯ ঃ ফখরুদ্দীন আহমেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকার
জ. ২০০৯ থেকে অধ্যাবধি ঃ শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার।

উপরোক্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক শাসনামলের গড় প্রবৃদ্ধির হার নির্ণয় করার জন্য আমাদের প্রতিটি শাসনামলের প্রকৃত জি.ডি.পি'র গতি প্রবণতা জানতে হবে কালপর্বে ধরে গড় প্রবৃদ্ধির হারের গতিপ্রবণতা (Average Trend Growth Rate) নির্ণয় করতে হবে। যেমন ধরুন ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৫-৭৬ সালে গড় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার নির্ণয়ের জন্য আমাদের প্রথমে ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছরের প্রকৃত জি.ডি.পি'র পরিমাণ জানতে হবে। উল্লেখ্য, যে অর্থ বছর বলতে বোঝায় ১৯৯২-৯৩

জুন থেকে ১৯৭৩ জুলাই পর্যন্ত। এরপর একে ভিত্তি ধরে ১৯৭৩-৭৪, ১৯৭৪-৭৫ এবং ১৯৭৫-৭৬ এই পরবর্তী ৩ বছরের প্রকৃত জি.ডি.পি (১৯৭২-৭৩ স্থির দামে) নির্ণয় করতে হয়ে। এইভাবে এই সময়ে সবকটি বছরের জি.ডি.পি সিরিজের প্রকৃত পরিমাণ জানা হয়ে গেলে আমরা উপরোক্ত তথ্যমালা ব্যবহার করে নিম্নোক্ত সমীকরণটি নির্ণয় করতে পারবো–

$LnYt = a + bt$

যেখানে, Yt = বিভিন্ন বছরের জি.ডি.পি'র Ln মান

t = সময় মান (এখানে ভিত্তি বছরের মান সর্বদা o ধরা হয়)

b = নির্দিষ্ট কালপর্বের গড় প্রবৃদ্ধির হার।

[উপরোক্ত পদ্ধতিটি জটিল কিন্তু অংক ও পরিসংখ্যানের শিক্ষকের কাজ থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও পাঠ নেয়া হবে বিবেচনায় এখানে আরো ব্যাখ্যা প্রদান নিষ্প্রয়োজন।]

এইভাবে যে কোন নির্দিষ্ট কালপর্বের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী জানা থাকলে ঐ কালপর্বের গড় প্রবৃদ্ধির হারের প্রবণতা (Average Trend Growth Rate) খুব সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব।

১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৫-৭৬ এবং ১৯৭৬-৭৭ থেকে ১৯৮১-৮২ ঃ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গড় হার সারণী ৩.৩-এ ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৭৪-৭৫ এই ৩ বছরের প্রকৃত জি.ডি.পি (১৯৭২-৭৩ স্থির দামে) তুলে ধরা হয়েছে। তালিকায় প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা নিম্নোক্ত সমীকরণটি পাই-

$LnYt = 10.72 + .65t$

অতএব, বলা যায় ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৫-৭৬ সাল পর্যন্ত গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৫ শতাংশ। ১৯৭৫-৭৬ সালকে আমরা হিসাব থেকে বাদ রাখতে পারি। কারণ যে সময়ে বাংলাদেশে অনেকগুলো ক্রান্তিকালীন ক্ষণস্থায়ী সরকার দ্বারা শাসিত হয়েছে।

সারণী ৩.৩ এর নিচের অংশে ১৯৭৬-৭৭ থেকে ১৯৮১-৮২ পর্যন্ত ৭ বছরের প্রকৃত জি.ডি.পি (১৯৭২-৭৩ স্থির দামে)-র পরিমাণ তুলে ধরা হয়েছে। উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা যে নতুন আরেকটি সমীকরণ পাই তা হচ্ছে-

$LnYt = 10.19 + .0376t$

অতএব, বলা যায় ১৯৭৬-৭৭ থেকে ১৯৮১-৮২ সাল পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল ৩.৭৬ শতাংশ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে প্রায়ই এই দুই সময়কাল তুলনা করা হয়। অনেকেই এই দুই কালপর্বের গড় প্রবৃদ্ধির হারের তুলনা করে ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৫-৭৬ সময়কালে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার প্রয়াস পান। অর্থনীতিবিদদের এ ধরনের কোন তুলনামূলক সিদ্ধান্ত প্রদানের আগে আরেকটু সতর্ক হওয়া উচিত। বস্তুত: এ ধরনের একমাত্রিক তুলনা থেকে কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। তদুপরি "প্রবৃদ্ধির হার" সামান্য বেশি হওয়া মানেই উচ্চতর উন্নতি নাও হতে পারে। এই সময়ের উচ্চতর প্রবৃদ্ধির অন্তত: ৩টি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। প্রথমত: মাত্র তিন বছরের ভিত্তিতে যে গড় প্রবৃদ্ধির প্রবণতা বের করা হয়েছে তা অত্যন্ত স্বল্পমেয়াদী এবং নির্ভরযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত: স্বাধীনতার সংগ্রামের ধ্বংসস্তুপের মধ্যে জি.ডি.পি'র পরিমাণ স্বাভাবিক ভাবেই অনেক নিচে নেমে গিয়েছিল এবং তার ফলে প্রবৃদ্ধির হার নিম্নমানের ভিত্তির (Low Base) তুলনায় অপেক্ষাকৃত উচ্চতর মান অর্জন করেছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল এবং সেই দিক থেকে প্রবৃদ্ধির গুণগত চরিত্র (Quality of Growth) প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে পড়েছে। অবশ্য এর বিপরীতে যুক্তি দিয়ে অন্যপক্ষ বলতে পারেন-প্রচন্ড প্রতিকুল ধ্বংসস্তুপের মধ্যে দাঁড়িয়ে যে প্রবদ্ধির হার অর্জিত হয়ে ছিলেন তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবিদার এবং দুর্ভিক্ষ যেটা হয়েছিল তা অনেকাংশে ছিল বহিরারোপিত । উল্লেখ্য, ১৯৭৩-৭৪ সাল বা দুর্ভিক্ষের বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য প্রদেয় চাল সাহায্য (পি.এল. ৮০-র চুক্তি অনুসারে) যথাসময়ে প্রদান করতে অস্বীকার করেছিল। অজুহাত হিসেবে বলা হয়েছিল যে, বাংলাদেশ

স্বাধীনতার সংগ্রামের ধ্বংসস্তুপের মধ্যে জি.ডি.পি'র পরিমাণ স্বাভাবিক ভাবেই অনেক নিচে নেমে গিয়েছিল এবং তার ফলে প্রবৃদ্ধির হার নিম্নমানের ভিত্তির তুলনায় অপেক্ষাকৃত উচ্চতর মান অর্জন করেছে।

কিউবাতে যে চটের ব্যাগ রপ্তানি করে তা কিউবা পুনরায় আমেরিকার শত্রু দেশ। ভিয়েতনামকে রপ্তানি করেছে।

সারণী ৩.৩ ঃ ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮১-৮২ : প্রকৃত জি.ডি.পি-র কালানুক্রমিক পরিমাণ

বছর	জি.ডি.পি (১৯৭২/৭৩ স্থিরদামে মিঃ টাকা)
১৯৭২-৭৩	৭৫৩০০
১৯৭৩-৭৪	৪৯০৭৩
১৯৭৪-৭৫	৫১৫৩৫
১৯৭৫-৭৬	৫৫৩৭২
১৯৭৬-৭৭	৫৬৩৬৯
১৯৭৭-৭৮	৬০২৪০
১৯৭৮-৭৯	৬২৮১৩
১৯৭৯-৮০	৬৩৫৮৬
১৯৮০-৮১	৬৭৫১৪
১৯৮১-৮২	৬৮৪৬০

উৎস: ড. মাহাবুব হোসেন ও এ. আর. খান, প্রাগুক্ত।

১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৯-৯০ ঃ গড় প্রবৃদ্ধির হার

আমরা ১৯৮২-৮৩ সালের জি.ডি.পি'কে ভিত্তি বছর হিসাবে গণ্য করে ১৯৮৯-৯০ সালের জি.ডি.পি হিসাবে গণ্য করবো। প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী ৩.৪ নং সারণীতে তুলে ধরা হয়েছে। উপরোক্ত তথ্যমালার ভিত্তিতে আমরা নিম্নোক্ত সমীকরণটি নির্ণয় করতে পারি:

$$LnYt = 11.17 + .0381t$$

অর্থাৎ এই কালপর্বে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৮১ শতাংশ। বলা যায় ১৯৭৫-৭৬ থেকে ১৯৮১-৮২ সমকালের তুলনায় এই হার নগণ্য পরিমাণে বেশি। কিন্তু এ্যাকডেমিশিয়ান, বুদ্ধিজীবী ও অর্থনীতিবিদগণ ১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৯-৯০ কালপর্বের এই নিম্ন হারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চরিত্রের তীব্র সমালোচনা করেছেন। এই সময়কালে আমাদের অর্থনীতিতে গণতন্ত্রহীনতা, অস্বচ্ছতা, লুট-পাট ও প্রচন্ড পরিমাণে পরনির্ভরশীলতা বা দাতা মুখাপেক্ষিতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৪-৯৫ ঃ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার

এই কালপর্বের ভিত্তি বছর হচ্ছে ১৯৯১-৯২ এবং সর্বশেষ বছর হচ্ছে ১৯৯৪-৯৫। এই চার বছরের কালানুক্রমিক জি.ডি.পি'র তথ্যাবলী ৩.৪ নং সারণীয় নিম্নাংশে তুলে ধরা হয়েছে। উপরোক্ত তথ্যমালার ভিত্তিতে আমরা নিম্নোক্ত সমীকরণটি নির্ণয় করতে পারি-

$$LnYt = 11.48 + .0318t$$

সারণী ৩.৪ ঃ ১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৯৪-৯৫ : প্রকৃত জি.ডি.পি-র কালানুক্রমিক পরিমাণ

বছর	জি.ডি.পি (১৯৭২/৭৩ স্থিরদামে মিঃ টাকা)
১৯৮২-৮৩	৭০৮১৭
১৯৮৩-৮৪	৭৩৮০৪

১৯৮৪-৮৫	৭৬৬৭৯
১৯৮৫-৮৬	৭৯৭৯২
১৯৮৬-৮৭	৮৩২৯২
১৯৮৭-৮৮	৮৫৮৭৪
১৯৮৮-৮৯	৮৮০৩৮
১৯৮৯-৯০	৯৩৫১৮
১৯৯১-৯২	১০১১৬৮
১৯৯২-৯৩	১০৫৭০৩
১৯৯৩-৯৪	১১০১৫৮
১৯৯৪-৯৫	১১৫০৫৫

উৎস্য: বি.বি.এস স্ট্যাটিস্টিকাল পকেট বুক, বিভিন্ন বছরের গ্রন্থ থেকে লেখক কর্তৃক পরিমিত।

এ থেকে বোঝা যায় যে, এই কালপর্বে গড় প্রবৃদ্ধির হার ৩.১৮ শতাংশ নেমে গিয়েছিল। অর্থনীতিবিদগণ এ সময়কালে সরকার প্রথম দিকে যে কঠোর কৃচ্ছতার নীতি অনুসারণ করা হয়েছিল তার প্রশংসা করে থাকেন। আবার পাশাপাশি এ কথাও মানতে হবে যে এর ফলে বাণিজ্য ঘাটতি ও পরনির্ভরশীলতা আগের সময়কালের তুলনায় কমে এসেছিল ঠিকই কিন্তু প্রবৃদ্ধির হারও এতে অনেকটা হ্রাস পায়। কেউ কেউ এই সময়কালকে "প্রবৃদ্ধির বিনিময়ে স্থিতিশীলতা" (Stability at the cost of growth) হিসাবে অভিহিত করেছেন।

১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০১ ঃ গড় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার

সরকারী তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১৯৯৪ এর তুলনায় ১৯৯৫ এর জি.ডি.পি ছিল ৪.৩ শতাংশ বেশি। অবশ্য ঐ বছরটিকে ক্রান্তিকালীন কেয়ার-টেকার সরকারের বছর হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। যাই হোক ১৯৯৫ এর তুলনায় ১৯৯৬ এর জি.ডি.পি ছিল ৫.৯ শতাংশ বেশি। অনুরূপভাবে ১৯৯৭ সালের জি.ডি.পি ছিল পূর্ববর্তী বছরের জি.ডি.পি-র তুলনায় ৫.৬ শতাংশ বেশি। প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্যে ১৯৯৮ সালের জি.ডি.পি পূর্ববর্তী বছরের জি.ডি.পি-র তুলনায় ৫.৬ শতাংশ বেশি। প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্যে ১৯৯৮ সালের জি.ডি.পি পূর্ববর্তী বছরের জি.ডি.পি-র তুলনায় ৫.২ শতাংশ বেশি দেখানো হয়েছে। এসব তথ্য থেকে সাধারণভাবে এটা অনুমান করা যায় যে, এ সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৫ শতাংশে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে এবং সেটা যদি ঠিক হয় তাহলে তা অবশ্যই পূর্ববর্তী সকল শাসনামলের তুলনায় তা বেশি।

তবে সম্প্রতি অর্থনীতিবিদরা এ বিষয়ে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট আপত্তি বা সমালোচনা উপস্থিত করেছেন। যেমন-১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ভয়াবহ বন্যার ফলে কৃষিতে উৎপাদন ঘাটতি হওয়ার কথা এবং তাছাড়া শিল্পের প্রবৃত্তির হার ছিল খুবই কম। কিন্তু এরপরও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৫.২ শতাংশ বলে সরকার যে দাবি করেছেন তা অযৌক্তিক ও সত্য নাও হতে পারে। দ্বিতীয় সমালোচনা হচ্ছে যে, সম্প্রতি সরকারের আয়ের চেয়ে ব্যয় প্রবণতা বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অর্থনীতিতে মৃদু

মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। যদিও এখনো একে "স্থিতিশীলতার বিনিময়ে প্রবৃদ্ধি" বা "Growth at the cost of stability" হিসেবে চিহ্নিত করার সময় আসেনি।

বাংলাদেশের ইপ্সিত ন্যূনতম প্রবৃদ্ধির হার কত হওয়া উচিত?

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ঠিক হুবহু কত তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। সাধারণত: ক্ষমতাসীন সরকারকে সর্বদাই একটি উচ্চতর সরকারী হারের কথা বলে থাকেন। সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের হিসাবের সঙ্গে বেসরকারী অর্থনীতিবিদ ও বিশ্বব্যাংকের প্রণীত হিসাবে সবসময় মিলে না। আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় এ কথাটি আমরা উল্লেখ করেছি। সাধারণতভাবে বলা যায় যে, ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সবমহলেই একটি ঐকমত্য ছিল যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ৪ থেকে ৫ শতাংশের মধ্যেই ওঠানামা করছে। ১৯৯৮-৯৯ সালের সর্বশেষ হিসাবানুযায়ী সরকারের মতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার হয়েছিল ৫.২ শতাংশ। যদি ধরে নিই যে, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার বর্তমানে ৮ শতাংশের সীমায় পৌঁছে গেছে। তাহলেও কি একথা বলা যায় যে, বাংলাদেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হতে শুরু করেছে?

> যদি আমরা ধরে নেই যে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১ থেকে ২ শতাংশের মধ্যে আমরা রাখতে সক্ষম হব, তাহলে ভবিষ্যতে ৫ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে আমাদের মাথা-পিছু আয় বৃদ্ধি পাবে ৩ থেকে ৪ শতাংশ হারে।

উন্নয়ন তত্ত্ব আমাদের শিখিয়েছে যে, একটি দেশের উন্নয়নের অর্থায়ন হচ্ছে সে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন। জনগণের জীবনযাত্রা মানের উন্নয়ন প্রধানত: আবার নির্ভর করেছে তাদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির উপর। সেই হিসেবে উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উন্নয়নের একটি আবশ্যকীয় শর্ত বটে। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হলে, উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার সত্ত্বেও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি নাও পেতে পারে অথবা অপেক্ষাকৃত কম হারে বৃদ্ধি পেতে পারে। যদি আমরা ধরে নেই যে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১ থেকে ২ শতাংশের মধ্যে আমরা রাখতে সক্ষম হব, তাহলে ভবিষ্যতে ৮ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে আমাদের মাথা-পিছু আয় বৃদ্ধি পাবে ৪ থেকে ৫ শতাংশ হারে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিয়ে যেসব গবেষণা হয়েছে তার থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে বাংলাদেশে যারা চরম দারিদ্রসীমার নিচে বাস করেন তাদের আয় প্রতি বছর ৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেলে, চরম দরিদ্ররা দারিদ্ররেখার উপরে উঠে আসবেন অন্তত: আরো ১৩ বছর পর। অবশ্য অন্যান্য দরিদ্রের জন্য লাগবে আরো কম সময়-মাত্র ৩ বছর। অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে আমরা বর্তমানে বলতে পারি যে আগামী ২৫ বছরের মধ্যে যদি আমরা আমাদের দেশকে দারিদ্রাশূণ্য দেখতে চাই তাহলে আমাদের ইপ্সিত প্রবৃদ্ধির হার হতে হবে ন্যূনতম ১ শতাংশ এবং পাশাপাশি আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যেন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২ শতাংশের নিচে থাকে এবং বিদ্যমান আয় বন্টন বৈষম্য বর্তমান যা আছে, তার চেয়ে তা যেন আর বৃদ্ধি না পায়। এটুকুও বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ বটে।

সারসংক্ষেপ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে আমরা সাধারণত জি.ডি.পি বা জি.এন.পির বার্ষিক বৃদ্ধির হার বুঝে থাকি। জি.ডি.পি ও জি.এন.পি সর্বদা এক সমান নাও হতে পারে। বিশেষত: ৮০'র দশক থেকে বাংলাদেশের উৎপাদন উপাদানসমূহের নীট বৈদেশিক আয় ইতিবাচক হওয়াতে জি.এন.পি, জি.ডি.পি'র চেয়ে বেশি ছিল। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সমান হয় তাহলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে না এবং জনগনের জীবনযাত্রার মান একইরকম থেকে যাবে বা

হ্রাস পাবে।

স্বাধীনতার পর আমাদের জি.ডি.পি এবং জি.এন.পি উভয়ের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। ফলে ১৯৭২-৭৩-৮৬-৮৭ পর্যন্ত হিসাবানুযায়ী আমাদের মাথাপিছু আয়ের গড় বৃদ্ধির হার ছিল ১.৯০ শতাংশ (মাথাপিছু জি.ডি.পি) এবং ২.১৮ শতাংশ (মাথাপিছু জি.এন.পি)। পাক-স্বাধীনতা আমলের তুলনায় তা যথাক্রমে ১৮৭ শতাংশ এবং ২৩০ শতাংশ বেশি। যদিও স্বাধীনতা পরবর্তীতে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু তার কতকগুলো সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন ঐতিহাসিকভাবে প্রবৃদ্ধির হার ৪ থেকে ৫ শতাংশের মধ্যেই ওঠানামা করেছে, এই প্রবৃদ্ধির বড় অংশটাই এসেছে বিভিন্ন রকম সেবা ও বাণিজ্য উপখাতের আয় থেকে-দেশের শিল্পায়ন থেকে নয়, এই প্রবৃদ্ধির একটা বড় ভিত্তি ছিল বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. জি.ডি.পি জি.এন.পি-র চেয়ে বেশি হবে যদি,

ক. নীট অপ্রত্যক্ষ কর নেতিবাচক থাকে;

খ. নীট অপ্রত্যক্ষ কর ইতিবাচক থাকে
গ. নীট অপ্রত্যক্ষ কর শূন্য থাকে।

২. জি.এন.পি, জি.ডি.পি-র চেয়ে বেশি হবে যদি;
ক. নীট বৈদেশিক উৎপাদনের উপাদান আয় ইতিবাচক থাকে;
খ. নীট বৈদেশিক উৎপাদনের উপাদান আয় নেতিবাচক থাকে;
গ. নীট বৈদেশিক উৎপাদনের উপাদান আয় শূন্য থাকে।

৩. সাধারণভাবে প্রাক-স্বাধীনতা আমলের মাথাপিছু আয় এর প্রবৃদ্ধির হারের তুলনায়, স্বাধীনতা পরবর্তী কালের মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধির হার
ক. বেশি ছিল; খ. কম ছিল; গ. সমান ছিল।

৪. জি.ডি.পি টাকায় মাপা হয়। তাই প্রকৃত জি.ডি.পি মাপতে হলে-
ক. প্রতি বছরের বাজারের দাম অনুযায়ী তা মাপতে হবে;
খ. যে কোন একটি বছরের বাজার দাম অনুযায়ী মাপতে হবে;
গ. একটি স্বাভাবিক ভিত্তি বছরের বাজার দামকে স্থির ধরে নিয়ে মাপতে হবে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. একটি নির্দিষ্ট কালপর্বের গড় প্রবৃদ্ধির হার নির্নয়ের পদ্ধতিটি কি।
২. আমাদের দেশের বিভিন্ন কালপর্বে গড় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার কত ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৫-৭৬ সালে গড় প্রবৃদ্ধির প্রবণতা ছিল ৬.৫ শতাংশ"- এই উচ্চ হারের সীমাবদ্ধতা ও সাফল্য উভয় সম্পর্কে মতামত প্রদান করুন।
২। বাংলাদেশের জন্য ন্যুনতম ইপ্সিত প্রবৃদ্ধির হার কত হওয়া উচিৎ।